তিলোত্তমা

সুব্রত মজুমদার

মনে আছে মেয়েটিকে প্রথম দেখেছিলাম যখন আমি কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়তে ঢুকেছিলাম। কোলকাতার আশেপাশের কোন একটা ছোট জায়গা থেকে এসেছিল। মনে আছে এই কারণে নয় যে মেয়েটি ডাকসাইটে সুন্দরী বা অসাধারণ ভালো পড়াশুনায় ছিল বলে। বরঞ্চ উল্টোটাই বলা যেতে পারে। মেয়েটির চেহারার মধ্যে ছেলেদের আকর্ষণ করার মত বা মেয়েদের হিংসে করার মত কিছু ছিল না। সাধারণ সাজপোষাক পরে সাধারণ চেহারাটাকে আরও সাধারণ করে রাখত। মাথার চুলকে টেনে বেঁধে একটা বড় খোঁপা আর সাদা পোষাকেই সবসময়ে দেখতাম তাকে। কপালে দিত না টিপ ঠোঁটে মাখত না কোন রঙ। আমাদের ক্লাসে মেয়েদের সংখ্যা ছিল এগারো, ওই মেয়েটি আসার পর হল বারো। আমরা ছেলেরা আড়ালে বলতাম দ্যা ডার্টি ডাজ্‌ন্‌। আমরা লক্ষ্য করলাম যে মেয়েটি কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না, নিজের মনে চুপচাপ উদাস হয়ে বসে থাকে। জোর করে প্রশ্ন করলে শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে উত্তর দেয়। কথা বাড়াবার কোনরকম চেষ্টা করেনা। ওকে আমরা হাসতেও কখনো দেখিনি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যেচে আলাপ করতে গিয়েছিল কিন্তু মেয়েটির ঠান্ডা বরফের মত স্বভাবের জন্য বেশি দুর এগোতে পারেনি। অবশেষে সবাই একসময়ে আমরা হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। মেয়েরা বলত ওর নাকি ভীষণ দেমাক, আমরা ছেলেরা সেকথা মানতাম না। মেয়েটির নাম জেনেছিলাম আশা। আমরা অনেক রকম নাম দিয়েছিলাম মেয়েটির। কেউ বলত যোগিনী, কেউ বলত সরস্বতী ঠাকুর, আবার কেউ কেউ ডাকত মাস্টারনী বলে। মেয়েটির ডানদিকের গালের ঠিক মাঝখানে ছিল একটা ছোট্ট কালো রঙ-এর তিল। আমি মেয়েটির নাম দিয়েছিলাম তিলোত্তমা।

খবরটা প্রথম এনেছিল অনন্যা। ওর এক আত্মীয়ের সঙ্গে নাকি আশার বাড়ির লোকেদের চেনাশোনা আছে। ওনারা আশাকে ছোট থেকে বড় হতে থেকে দেখেছেন। ছোটবেলার থেকে আশা নাকি খুব হাসিখুশি স্বভাবের মেয়ে। চেহারাতেও একটা লালিত্য ছিল। কিন্তু বিয়ের পর থেকে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল আশার জীবনে। জেনেছিলাম আশার বয়স উনিশ। বিয়ে হয়েছিল গ্রামাঞ্চলের এক উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে। বরের বয়স ছিল আশার থেকে অনেকটা বেশি। উপায় ছিল না। একে অভাবের সংসার, তারপর দেখতে ভালো না, রং ময়লা, বিয়ে হচ্ছিল না। বাবা আর মা অনেক ধার দেনা, অনেক পণের বিনিময়ে জামাইকে কিনেছিলেন। কিন্তু সুখ আশার কপালে লেখা ছিল না। বিয়ের প্রথম সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই আশার বর মারা যায় মোটর সাইকেল একসিডেন্টে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আশাকে দোষ দেয় তাদের ছেলের মৃত্যুর জন্য। অপয়া আর রাক্ষুসী বলে তাকে অপবাদ দেয়। অনেক কান্নাকাটি অনেক হাতেপায়ে ধরাধরি করেছিল আশা শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কাছে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু কোন কাজ হল না। অবশেষে একদিন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আশাকে তার বাপের বাড়ি তুলে দিয়ে গেল। অসহায় বাবা মা আর কি করবে, মেয়েকে তো আর ফেলে দিতে পারে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আশাকে তাঁরা আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়ে ছিলেন। জীবনের ওপর বিতৃষ্ণায় আশা একবার আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সময়মত ধরা পড়ে যাওয়ায় বেঁচে যায়। অবশেষে এক কাকিমার প্রশয়ে আশা ঠিক করে ও পড়াশুনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। কাকিমাই সব খরচা বহন করার ব্যবস্থা করেন। সব শোনার পর আশার ওপর আমাদের মন দুঃখ আর সহানুভূতিতে ভরে উঠেছিল। আমার সব বন্ধুরাই কোন না কোন ভাবে আশাকে তার অজান্তে সাহায্য করার চেষ্টা করত। কেন জানিনা আমি আশাকে কোন সাহায্য করিনি, উলটে আমি তার সঙ্গে ভয়ানক এক খেলায় মেতে উঠেছিলাম কাউকে না জানিয়ে।

আমি আশাকে প্রেমপত্র লিখতে শুরু করলাম। না খামের ভিতরে পোরা, সুন্দর রঙ্গিন কাগজে লেখা স্ট্যাম্প আটকানো চিঠি নয়। খাতার পাতা থেকে ছেঁড়া ছোট চিরকুটে লেখা প্রেমপত্র। আমি শুধু তিনটে কথা লিখতাম চিরকুটে – 'আমি তোমায় ভালবাসি'। তক্কে তক্কে থাকতাম এবং সুযোগ পেলেই সবার অজান্তে আমার লেখা চিরকুটটা আশার বইয়ের দুটো পাতার মাঝখানে গুঁজে দিতাম। তারপর অনামি এক লেখকের চিরকুটে লেখা ওই তিনটি কথা পড়ে আশার কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। আদিঅনন্তকাল ধরে চলে আসা পৃথিবী বিখ্যাত এই তিনটি কথায় ঘায়ল হয়নি এমন মানুষ দুনিয়ায় কোথাও আছে কি না আমার জানা ছিল না। প্রথম চিঠিটা লেখার পর প্রায় তিনদিন উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করার পরেও আশার মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না। ধরে নিলাম যে তার মানে হয় আশা বইটার ভিতরে রাখা চিরকুটটা দেখার সুযোগ পায়নি অথবা আশা মানুষ নয়। আমিও হেরে গিয়ে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। একদিন সুযোগ বুঝে আবার একটা চিরকুট রেখে দিলাম দুটো পাতার মাঝখানে। প্রফেসর ক্লাসে আসার আগে আমরা ছেলেরা আর মেয়েরা নানারকম হাসি আর ঠাট্টায় মসগুল হয়ে থাকতাম। আর উনি ক্লাসে প্রবেশ করার সাথে সাথে সব বন্ধ হয়ে যেত। আশা কোনদিন আমাদের এই হাসিঠাট্টায় যোগ দিত না। একটা বইয়ের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে থাকত। আজ আমি শুধু আশাকে লক্ষ্য করছিলাম। আজ যেন আশাকে একটু অন্যমনস্ক লাগছে। মনের ভুল কিনা জানিনা, একটা পরিবর্তনও আশার মধ্যে মনে হল লক্ষ্য করলাম। সবসময়ে প্রথম সারির বেঞ্চে বসা আশাকে এর আগে কখন ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের সারিতে বসা ছেলেদের দিকে তাকাতে দেখিনি। আজ দুবার দেখলাম আশা ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকাল। একবার তো প্রায় আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল। আমার বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠেছিল। ধরা পড়ে গেলাম নাকি? না দেখলাম ঘাড়টা ঘুরিয়ে আশা আবার সামনের দিকে ফিরে মাথা নিচু করে বসে পড়ল। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। কোন ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রফেসরকে প্রশ্ন করলে আশা আজকাল মাথা ঘুরিয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থাকে। আশা যেন একটা কিছু খুঁজছে ওর চোখ দেখে আমি বুঝতে পারতাম।

আমার খেলা চলতে লাগল। আমার চিরকুটে লেখা কথার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল আর সেই সঙ্গে পরিবর্তন হতে সুরু করল আশার ব্যবহারের। আশা আজকাল অন্যদের সঙ্গে কথা বলে, পিছন ফিরে ছেলেদের দিকে তাকায়। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায় না, ঠাট্টা ইয়ার্কিতেও যোগদান করে। আমার কেন যেন মনে হত আশার চোখদুটো সবসময় কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়। আমি যত আশার ব্যবহারের পরিবর্তন দেখতাম ততো মনে মনে খুশি হতাম। একবার একটা পরীক্ষা করার ইচ্ছে হল। চিরকুটে লিখলাম তোমায় হাল্কা নীল রঙ-এর শাড়ী আর খোলা এলোচুলে দেখতে চাই। পরের দিন ক্লাসে ঢুকে আশাকে দেখলাম না। লাস্ট বেঞ্চে বসে আগের দিনের হোমওয়ার্কটা তন্ময় হয়ে চেক্ করছিলাম শেষ বারের মত, জমা দেওয়ার আগে। অর্ণবের কনুইয়ের ধাক্কায় চমক ভাঙ্গল। অর্ণব আঙ্গুল দিয়ে সামনের দিকে তাকাতে বলল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক অদ্ভুত ব্যাপার। যা দেখলাম তাতে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ক্লাসের সব ছেলেরা আর মেয়েরা অবাক হয়ে তাদের সামনে দাঁড়ানো আশার দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে বলে আশার সারা মুখে একটা লজ্জা মেশানো সুন্দর হাসি। সব থেকে অবাক হলাম আমি। আশার পরনে আজ হাল্কা নীল রঙ্গের শাড়ী আর চুলটা খোলা। কপালে পরেছে একটা বড় টিপ আর ঠোঁটে লাগিয়েছে একটা হাল্কা রং। আশাকে আজ সত্যি সুন্দর লাগছে দেখতে। মেয়েটা এত সুন্দর দেখতে আগে কখনো লক্ষ্য করিনি তো।

ভাগ্যের চক্র কাকে কখন কোথায় নিয়ে যায় কেউ জানে না। আমার সুযোগ এলো এক নামকরা কলেজে এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে যাওয়ার। একদিন সবাইকার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে আমি আমার নতুন কলেজ জীবনের জন্য যাত্রা শুরু করলাম। আশার কাছ থেকেও বিদায় নিয়েছিলাম অন্যদের মতই। অল্পদিনের আলাপে আলাদা করে আমাকে মনে রাখার কথা নয় আশার। আমাকে বিদায় জানিয়েছিল অন্যদের মতই। তাতে আন্তরিকতা হয়ত ছিল, ছিল না কোনরকম ঘনিষ্ঠতা। আমি শুধু মনে মনে বলেছিলাম তিলোত্তমা তুমি ভালো থেকো, তোমার ভালো হোক। তারপর অনেক যুগ কেটে গেছে। আমার জীবনে এসেছে অনেক পরিবর্তন। আমি দেশ ছেড়ে আমেরিকায় বসবাস শুরু করেছি। এখানে সাজানো অথচ একটি ছোট্ট নির্জন শহরে আমার বসবাস। এখানে আমার নিজের বলে কেউ নেই। একাকী নিঃসঙ্গতায় আমার জীবন কাটে। প্রায় দুটো যুগ কেটে গেছে দেশ ছেড়ে এসেছি। ফেলে আসা দেশের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। যখন মন খারাপ লাগে তখন মাঝে মাঝে দেশে গিয়ে স্পঞ্জের মত ভিজিয়ে নিয়ে আসি যতটা পারি দেশের সব কিছুকে নিজের দেহে আর মনে। একবার দেশে যাওয়ার একটা সুযোগ এলো যখন আমন্ত্রণ পেলাম আমার এক নিকট আত্মীয়ের বড় মেয়ের বিয়েতে আসার জন্য। অনেক দিন দেশের কোন বিয়ে বাড়ি আমার যাওয়া হয়নি, তাই সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না।

দেখলাম বিয়ের ব্যাপারে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে আবার অনেক কিছু একই রকম আছে। আমার ওপর ভার পড়েছিল ছেলের বাড়ির লোকেদের আদর আপ্যায়নের যেন ত্রুটি না হয় তার খোঁজখবর রাখার জন্য। দেখলাম ছেলের বাড়ির লোকজন খুবই ভদ্র, তাঁরা অল্পেই খুশী, তাই আমার কাজ অনেক কম মনে হচ্ছিল। হঠাৎ ছেলের বাড়ির একজন আমাকে দেখে এগিয়ে এল। আমার নাম ধরে ডাকল। আমি চিনতে পারলাম। আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধু অর্ণব। দুই বন্ধু ফিরে গেলাম অনেক বছর আগের সেই ফেলে আসা দিনগুলোতে। এক ভদ্রমহিলা একসময়ে অর্ণবের কাছে এসে দাঁড়াল। অর্ণব আলাপ করিয়ে দিল। চিনতে পারলাম অনন্যাকে। আমরা তিনজনে মিলে গল্প জুড়ে দিলাম। আমাদের সব বন্ধুদের কথা শুনছিলাম অনন্যার কাছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল আশার কথা জানার জন্য। কিন্তু ভিতর থেকে কে যেন আমায় বাধা দিচ্ছিল। হঠাৎ অনন্যাই আশার কথা ওঠাল। জানতে পারলাম যে আশা ডক্টোরেট করেছে মাইক্রোবায়োলজীতে। নামকরা বিলিতি কোম্পানিতে উচ্চপদে কাজ করে আশা। বিয়ে করেছে, দুটি সন্তান, একটি ছেলে একটি মেয়ে। খুব সুখের সংসার আশার। তাছাড়া নানারকম সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও নিজেকে ব্যস্ত রাখে সে। এত হাসিখুশি আমুদে আর এত পপুলার যে আমি নাকি দেখলে চিনতেই পারব না যে এই আশাই আমাদের সেই আশা।

একটু বাদে ওরা দুজনেই আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে গেল। আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজে নিয়ে। মনে মনে খুশি হলাম আমার তিলোত্তমা ভাল আছে জেনে। আজ এতদিন বাদে এতগুলো বছর পেরিয়ে আসার পর আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় আশাকে লেখা আমার সেই প্রেমপত্রের কথা। সেই চিরকুটে লেখা খেলার কথা। অনেক ছোট ছোট ঘটনা সিনেমার ফ্ল্যাশ্‌ব্যাকের মত ফিরে এল আমার মনের আয়নায়। একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন আমার মাথার মধ্যে ভিড় করে এল। আচ্ছা, ওই খেলাটা কি আমার ছোটবেলার ছেলেমানুষি ছিল? নাকি আমি কি জেনেশুনে আশার সঙ্গে ওই খেলা খেলেছিলাম? আমি কি আশাকে ভালবাসতাম? নাকি আমার আরো গূঢ় কোন উদ্দেশ্য ছিল?